নির্মাণ-শিল্পের কথা ও কাহিনি

তপনের বাবা কাঠের কাজ করেন। বাড়ি তৈরির সময় জানালা-দরজা লাগাতে যান। একটা পাকা বাড়ি তৈরির সময় তপন বাবার সঙ্গে দেখতে গিয়েছিল।

সেখানে অনেক লোক। কেউ চৌবাচ্চায় ইট ফেলছেন। কেউ ভেজা ইট তুলে তুলে এগিয়ে দিচ্ছেন। কেউ কোদাল দিয়ে বালি-সিমেন্ট-জল মাখছেন। একজন আবার দেয়ালে জল দিচ্ছেন। বাবা বলেছিলেন— এঁরা জোগানদারের কাজ করছেন।

একজন হাতে কর্নিক নিয়ে ইট গাঁথছিলেন। একজন ওলনদড়ি ধরে গাঁথনি ঠিক হয়েছে কিনা দেখছিলেন।

একজন সরু তার দিয়ে রডের খাঁচা বাঁধছিলেন। বাবার মুখে তপন শুনেছে ওঁরা রাজমিস্ত্রি।

দরজা-জানালার পাল্লা লাগাতে নানারকম করাত, বাটালি, অন্য অনেক যন্ত্র লাগে। সেসব তপনের চেনা। কিন্তু ও কখনও মাটির বাড়ি তৈরি করা দেখেনি। ওর জন্মের আগে ওদের বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কলঘরটা পাকা। আর সব ঘরের দেয়াল মাটির, চাল টিনের।

ডমরু বলল— সাগিনদের পাড়ায় একটা মাটির ঘর তৈরি হচ্ছে। একদিন দেখে এলেই হয়।

পরদিনই ওরা সবাই একটু ঘুরে মাটির ঘর তৈরি করা দেখে স্কুলে গেল।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নানারকমের ঘর তৈরি করতে নানারকমের সহযোগিতামূলক কাজ করতে হয়। সেসব কাজের বিষয়ে আলোচনা করে নীচে লেখো:

বাড়ি তৈরির কাজ	অনেকে মিলে যেসব কাজ করা হয়	যাঁরা কাজ করেন তাদের কাকে কী বলা হয়
১. দেওয়াল তোলা		
২. ঘরের চাল ছাওয়া	বাঁশ বা কাঠ কাটা, কাঠামো তৈরি, চালের কাঠামো বসানো, খড় দেওয়া	ঘরামি
৩.		
৪.		

বাড়িতে কত কিছু

বোতলে খাবার জল ভরতে ভরতে অলিভিয়া ভাবল, বাড়ি তৈরি করতে আরও লোক লাগে।

আমাদের বাড়িতে আরো কত্তো কী রয়েছে! বারান্দার গ্রিল, দেয়াল-আলমারি, জলের পাম্প। বাবা কি জানে কতো লোক মিলে এসব করেছে! বাবাকে বলতেই বাবা খুব হাসলেন। তারপর বললেন— বাড়ি তৈরির সময় দেখা যায় না, এমন অনেক লোকও লাগে। জানালার কাচ যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁরাও বাড়ি তৈরির কাজই করেছেন।

জল তোলার পাম্প যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁদেরও এর মধ্যে ধরতে হবে। আবার বাড়ি করার আগে একটা নকশা করতে হয়। কোথায় কোন ঘর থাকবে? কোন দিকে

দরজা-জানালা রাখলে ভালো হবে।
অলিভিয়া বলল— ভালো হবে মানে?
---ঘরে ঢোকা-বেরোনোর সুবিধে হবে। শোওয়ার খাট, আলমারি, বইয়ের তাক রাখার সুবিধে হবে।

পরদিন অলিভিয়া স্কুলে এসব বলতেই দিদিমণি বললেন--- তাহলে বাড়িতে কত কিছু থাকে জানা হয়ে গেল। কত লোক মিলে কাজ করেন তাও তোমাদের জানা হয়ে গেল।

একথা শুনে ডমরু, কেতকী, সুধন, রবীনরা নিজেদের বাড়িতে কী আছে তা বলতে লাগল।

— আমাদের বাড়িতে মাটির কলসি আছে। ওই কলসিতে জল রাখা হয়। গরমকালে জল খুব ঠান্ডা থাকে।

— আমাদের বাড়িতে একটা বই রাখার আলমারি আছে। বাবা চায়ের পেটির কাঠ দিয়ে বানিয়েছে। কাকার মোটামোটা বই থাকে সেখানে।

— আমাদের বাড়ির চাল টিনের। বাড়ির ভিতরে একটা টিউবওয়েল আছে।

— আমাদের বাড়িতে একটা ধানঝাড়া মেশিন আছে।

— আমাদের বাড়ির কাছেই মাঠ। কিন্তু বাড়িটা অনেক উঁচু জায়গায়।

একথা শুনে অলিভিয়া বলল— বাবা বলেন, একটু উঁচু জায়গায় বাড়ি করতে হয়। যাতে বন্যার জল ঘরে না ওঠে! চাষের জমি আর বাড়ির জমি আলাদা।

দিদিমণি বললেন— তোমার বাবা ঠিক বলেছেন।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নানা ধরনের বাড়ি তৈরি করতে কী কী লাগে, বাড়ির ভিতর কী কী থাকে নীচে লেখো :

কী ধরনের বাড়ি	বাড়ি তৈরি করতে কী কী লাগে	বাড়ির ভিতর কী কী থাকে
পাকা বাড়ি	ইট, সিমেন্ট, বালি, জল, পাথরকুচি, লোহা কাঠ, টিন, রং	
কাঁচাবাড়ি		

বসতবাড়ির আশপাশ

বাড়ি করতে তো আলাদা উঁচু জমি লাগে। কিন্তু পাশে যদি নদী থাকে? নদীর তো পাড় ভেঙে যায়!

আবার পাশে যদি বড়ো রাস্তা থাকে? সারাদিন বাস-লরি যাবে। ধুলোয় ঘর বোঝাই হবে। আর শব্দও হবে খুব। ভারী লরি দিনরাত বাড়ি কাঁপিয়ে যাবে।

বাজারের গায়ে বাড়ি হলে? হইচই হবে খুব। দুপুরের পর বাজে গন্ধও আসবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে স্কুলে যাচ্ছিল অনন্যা। পথে দেখা

লক্ষ্মীমণির সঙ্গে। এসব শুনে লক্ষ্মীমণি ওদের দেশের বাড়ির কথা বলল। চারপাশে খাঁ খাঁ মাঠ। কাছেই পাথরের খাদান। সারাদিন পাথরের গুঁড়ো উড়ে আসে। পাশে ছোটো রাস্তা। কখনও জল দাঁড়ায় না। কিন্তু রাস্তা দিয়ে লরি ঢোকে। খুব ধুলো ওড়ায়। ওর ঠাকুরদা ওই খাদানে কাজ করেন। বাবাকে বলেছিলেন অন্য জায়গায় কাজ খুঁজতে।

রিম্পা বলল— আমার দাদুদের বাড়িতে হাতির খুব উৎপাত।

স্কুলে দিদিমণি সব শুনলেন। অন্যরাও শুনল।

পিকু বলল— খাঁ খাঁ মাঠে বাড়ি হলে খুব মুশকিল। বাড়ির পাশে গাছপালা থাকা দরকার। একটু ছায়া হয়।

আয়ুব বলল— বাড়ির কাছে জলের স্তর পাওয়া চাই। নইলে কল বসানো যাবে না। খাওয়ার জল আনতেই দিন কেটে যাবে।

দিদিমণি বললেন— কাছে পিঠে কী কী থাকলে বাড়ির পক্ষে ভালো সেসব তাহলে বোঝা গেল।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমাদের যার যেখানে বাড়ি সে সেখানকার কথা ভালোভাবে জানো। সেসব কথা নীচে লেখো:

কোন জায়গার বাড়ি	কী কী থাকলে সেখানে বাড়ি করা ভালো	কী কী থাকলে সেখানে বাড়ি করা অসুবিধা

বাড়ির গায়ে ঝড়ঝাপটা

নদীর পাড় ধসে বাড়ি পড়ে গেলে খুব মুশকিল! নদীর যে পাড় ভাঙছে সেই পাড়ে বাড়ি করা যাবে না। ভূমিকম্প হলেও খুব সমস্যা।

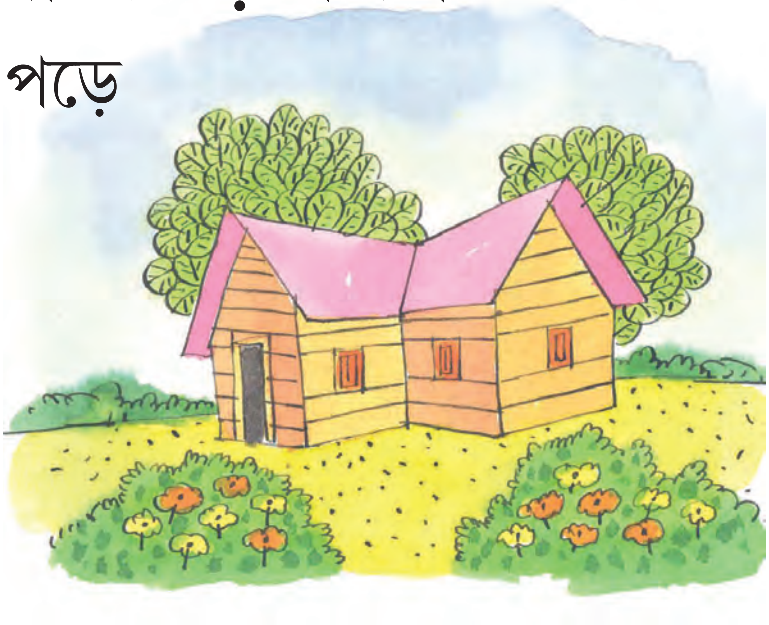

বাড়ি ফেটে যায়। ইট-সিমেন্টের বাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। যেখানে বেশি ভূমিকম্প হয় সেখানে কাঠের বাড়ি করলে কিছুটা সুবিধা। চালটা টিনের হলে ভালো। সেই কাঠ আর টিন দিয়ে আবার নতুন বাড়ি করে নেওয়া যায়। যেখানে মাটির নীচ থেকে কয়লা তোলা হয় সেখানেও ধস নামে। বাড়ি বসে যায়। কয়লা তুলে কয়লার খাদ বালি দিয়ে ভালো করে বুজিয়ে দিতে হয়। ওইসব জায়গায়ও হালকা কাঠ ও টিন দিয়ে বাড়ি করলেই ভালো হয়।

মরিয়ম ওর মেসোমশায়ের কাছে এসব শুনেছে। উনি কয়লাখনিতে কাজ করেন। মরিয়মদের গ্রামে বন্যা হয়। তাই আজকাল সবাই মেঝেটা খুব উঁচু করছে। পাকা বাড়ি করলে একতলায় ঘরই করছে না। কয়েকটা পিলারের উপর ছাদ ঢালাই করছে। তার উপর দোতলায় থাকার ঘর করছে।

রূপকের দাদু থাকেন সাগরের কাছে। সেখানে খুব জোরে

ঝড় হয়। তাঁদের পাকা বাড়িও একতলা। ঝড়ে উঁচু বাড়ির বেশি ক্ষতি হয়।

সব গল্প শুনে দিদিমণি বললেন— তবে দরকার হলে খুব শক্তপোক্তভাবে উঁচু বাড়িও করা যায়।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে বাড়ি করায় ক্ষতি বিষয়ে আলোচনা করে লেখো:

কোন অঞ্চলের বাড়ি	কী কী দুর্যোগ হতে পারে	কী কী ক্ষতি হতে পারে	কী কী সাবধানতা নেওয়া যায়

খোলা আকাশের নীচে

ঝড়ে ঘর পড়ে যায়। বন্যায় ঘরে জল উঠে আসে। তখন ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে হয়। বড়োঠাকুমাদের তিনবার এমন যেতে হয়েছে। শেষবার যখন গেছেন, তখন কেতকীর বাবা ছোটো। সেবার

হাইস্কুলের দোতলায় থাকতে হয়েছিল কুড়ি দিন। কেতকী শুনে অবাক। পরদিন স্কুলে সবাইকে বলল এই কথা।

দিদিমণি বললেন— এ তো শুধু ঝড়-বন্যার জন্য! অনেক কাল আগেকার মানুষদের কী করতে হতো জানো?

হামিদ বলল— জানি, দিদি। গুহায় থাকত। এখনকার মতো ঘরবাড়ি ছিল না।

— ঠিক বলেছ। তবে গুহাতেও শান্তি ছিল না। কিছুদিন পরে সেখানে খাবার ফুরিয়ে যেত।

— তখন অন্য জায়গায় চলে যেতে হতো?

— হ্যাঁ। এভাবে ঘুরে বেড়ানোর জীবনকে বলে যাযাবর জীবন। অল্প কিছু জিনিসপত্র আর পোষা পশুদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ত তারা। মাসের পর মাস হেঁটে ঘুরত।

— রাতে থাকত কোথায়?

— খোলা আকাশের তলায় থাকত। গাছতলায়ও থাকত। ছোটোখাটো গুহা পেলে থাকত। আবার তাঁবুতেও থাকত।

— তাঁবু কী করে করত? কাপড় তো ছিল না!

— পশুদের চামড়া জুড়ে তাবু তোর করত। বাচ্চাদের তাঁবুর ভিতর রাখত। আর বড়োরা বাইরে পালা করে পাহারা দিত।

— পাহারা কীসের জন্য?

— যাতে অন্য দলের মানুষরা এসে ছাগল-ভেড়া নিয়ে যেতে না পারে। তাছাড়া বাঘ-সিংহের ভয় আছে।

— কেন? বন থেকে দূরে তাঁবু তৈরি করত না কেন?

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

দুর্যোগে পড়ে কীভাবে মানুষ থাকার জায়গা বদলেছে সে বিষয়ে তোমার ধারণাগুলো নীচে লেখো :

আগেকার মানুষ কেন বারবার থাকার জায়গা বদলাত	জায়গা বদলাতে কী কী অসুবিধে হতো

আগের দিনের কথাই অণিমার মাথায় ঘুরছিল। দিদিমণি ক্লাসে আসতেই সে বলল— বাঘ-সিংহরা সুযোগ পেলেই মানুষদের খেয়ে নিত, তাই না?

— সেই ভয় তো ছিলই। তাছাড়া ওইসব গুহা বা বন-জঙ্গল তো বাঘ-সিংহদেরও থাকার জায়গা!

রফিক বলল— বাঘ-সিংহরাও ঘরবাড়ি চায়!

বৈশাখী বলল— সবাই চায়। মৌমাছিরা থাকার জন্য চাক তৈরি করে দেখিসনি?

রবীন বলল— পাখির বাসা। এক এক পাখি এক একরকম বাসা করে।

অ্যালিস বলল— মেঠো ইঁদুরের বাসা দেখেছিস। আমি দেখেছি। আবার পিঁপড়ের চাক, উইঢিবিও তো বাসা।

দিদি বললেন— বাঃ! তোমরা তো অনেক পশুপাখি, পতঙ্গের ঘরবাড়ি বিষয়ে জানো দেখছি।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

পশু-পাখি, পতঙ্গদের ঘরবাড়ি নিয়ে যা কিছু তোমরা জানো নীচের খোপে সেসব লেখো:

পশু-পাখি, পতঙ্গের নাম ও তার বাসস্থানের নাম	বাসস্থানের ছবি	কী কী দিয়ে তৈরি	কোথায় দেখা যায়

পরিবার ও পরিবারের শাখাপ্রশাখা

সুমনার আজ খুব আনন্দ। ছোট্ট ভাইকে নিয়ে ঠাকুমা, কাকা আর কাকিমা এসেছেন। সুমনা এবার দিদি হয়ে উঠল!

ক্লাসে এসে সুমনা এসব বলল। শুনে দিদিমণি বললেন--- মানে, তোমাদের পরিবারে একজন বাড়ল।

হামিদ বলল— পরিবার মানে?

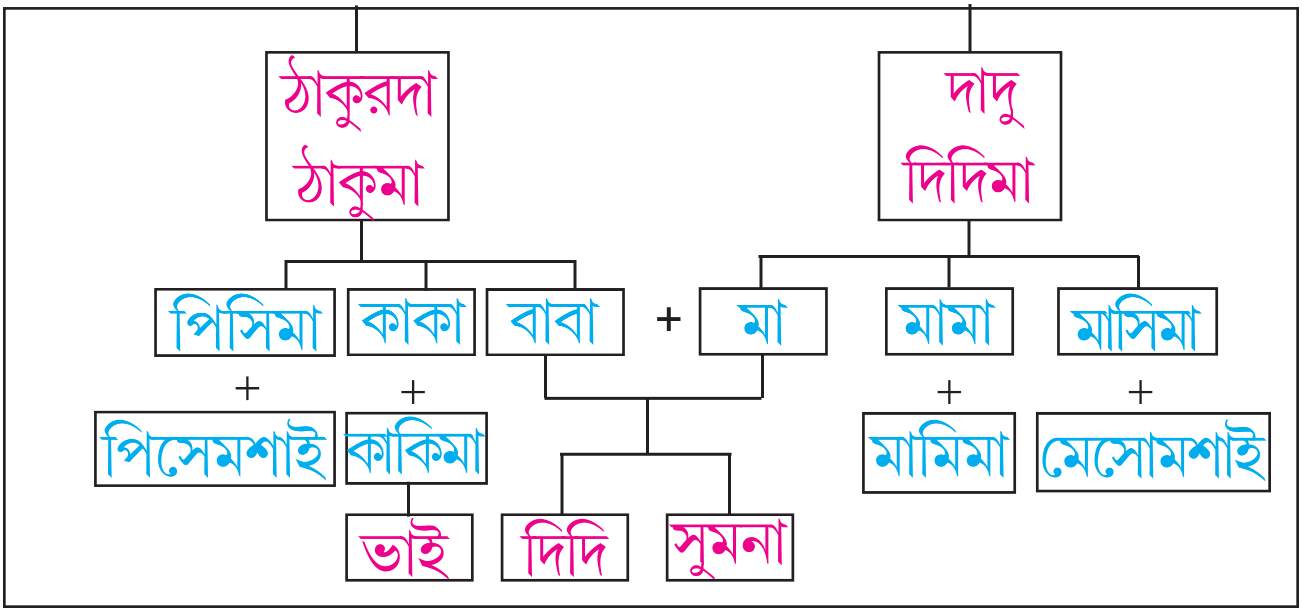

তিতলি বলল— জানিস না? বাড়ির সবাই মিলে পরিবার হয়।

দিদিমণি বললেন— তা বলতে পারো।

চয়ন বলল— সুমনাদের পরিবারে ওর ঠাকুরদা সবচেয়ে বড়ো? ঠাকুরদাকে দিয়ে পরিবার শুরু?

— এখন ঠাকুরদা, ঠাকুমা সবচেয়ে বড়ো। আগে ওঁদের বাবা-মা ছিলেন। এবার তাহলে ঠাকুরদা-ঠাকুমা থেকে শুরু করে পরিবারের শাখা-প্রশাখা কীভাবে দেখাতে হয় দেখো।

এই বলে দিদি বোর্ডে লিখতে শুরু করলেন। সুমনাকে বললেন —তোমার বাবা আর মায়েরা কয় ভাই-বোন?

— বাবা, কাকা, পিসি। আর মায়েরা তিন ভাই-বোন। মা, মামা আর মাসি।

— আর তোমরা?

— দিদি আর আমি। আর আজ কাকিমা ছোটো ভাই নিয়ে এল!

এর মধ্যে দিদি বোর্ডে অনেকটা লিখে ফেললেন। বললেন— এই হলো সুমনাদের পরিবারের শাখা-প্রশাখা।

দেখে বুঝে নাও।

সবাই দিদির লেখাটা মন দিয়ে দেখল।

খানিক পরে সানিয়া বলল— দিদি, আমাদের পরিবারের শাখা-প্রশাখা লিখে দেখাব?

— নিশ্চই দেখাবে!

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

পরিবারের শাখা-প্রশাখা লেখা নিয়ে আলোচনা করো।
তারপর নিজের পরিবারের শাখা-প্রশাখা লেখো:

পরিবারের শাখা-প্রশাখা ও নিকট আত্মীয়

সানিয়া নিজেদের পরিবারের শাখা-প্রশাখা লিখে দেখাল। দাদা-দাদি সবার চেয়ে বড়ো। ওরা নিজেরা দুই ভাইবোন। সুমনা বলল— দিদি, কাকার বিয়ের পরে কাকিমা আমাদের পরিবারের সদস্য হলেন।

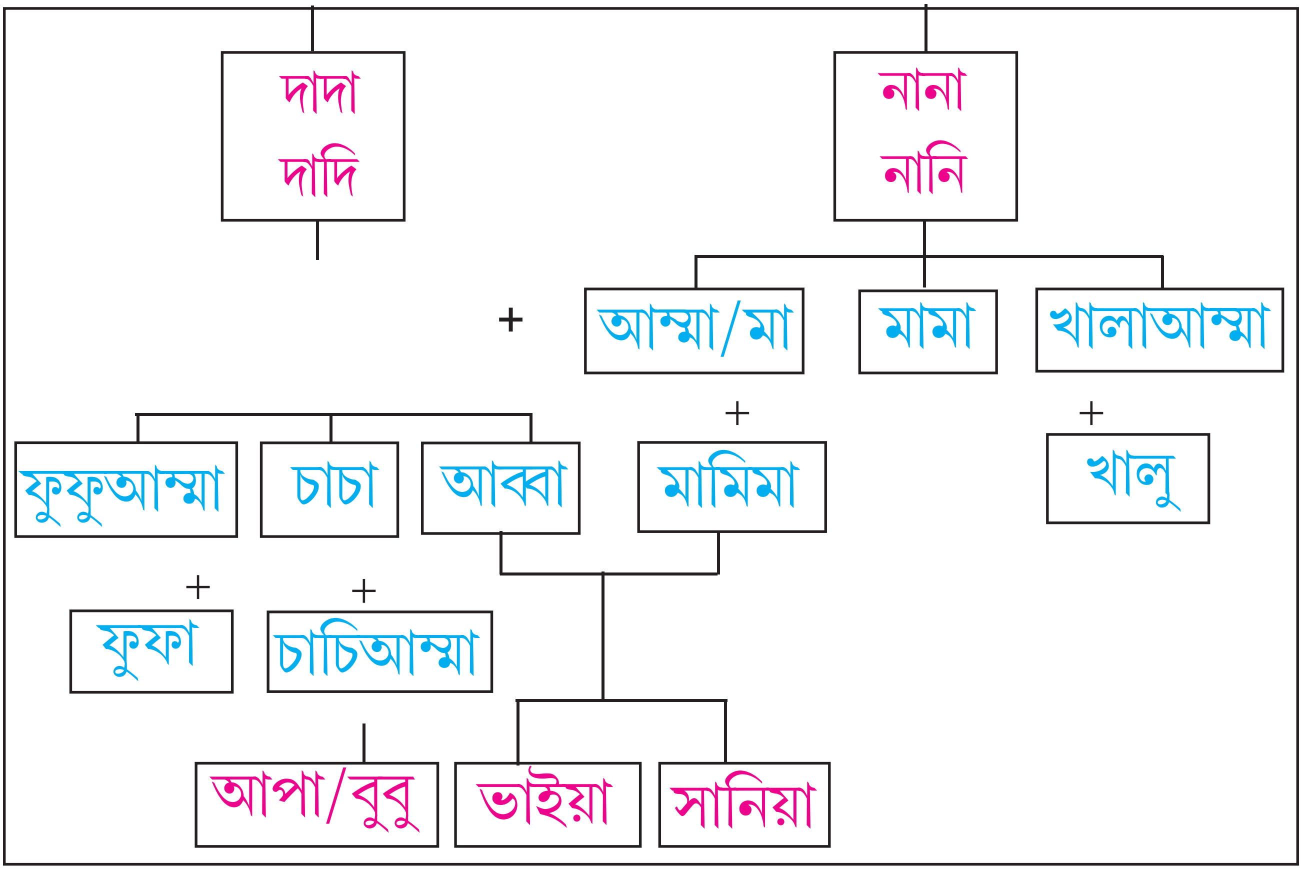

— এভাবেই নতুন পরিবার গড়ে ওঠে।

চিন্ময় বলল— আচ্ছা দিদি। আমার মাসি আছেন। মাসির ছেলে সৌম্য। আমার খুব বন্ধু। কলকাতায় থাকে। আমাদের পরিবারের শাখা-প্রশাখায় ওদের নাম থাকবে?

--- রাখতে পারো। তবে সেভাবে লিখতে গেলে পরিবারের শাখা-প্রশাখাটা খুব বড়ো হয়ে যাবে। তুমি ওদের নিকট আত্মীয় বলতেও পারো।

অণিমা বলল— তাহলে পিসিমার ছেলেমেয়েরাও নিকট আত্মীয়?

রুহুল বলল— মামার ছেলেমেয়েরাও তাই?

— এঁরা নিকট আত্মীয়। তবে পরিবারের শাখা-প্রশাখাতে এঁদের কথা লিখতে পারো।

মানস বলল--- বুঝেছি। আমি মামাতো, মাসতুতো, পিসতুতো ভাই-বোনদের নিকট আত্মীয়ই বলব।

নাম দিয়ে পরিবারের শাখা-প্রশাখা

তুফানের দিদি একটা বই পড়ছিল। ছোটো ছোটো লেখায় পাতা জোড়া পরিবারের শাখা-প্রশাখা। শুরুতেই লেখা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি। নামটা তুফানের চেনা। *টুনটুনির বই* এঁরই লেখা। একটু নীচে আর একটা নাম – সুকুমার রায়। ইনিই তো *আবোল-তাবোল* লিখেছেন! চেনা চেনা নাম দেখে তুফান মন দিয়ে দেখল।

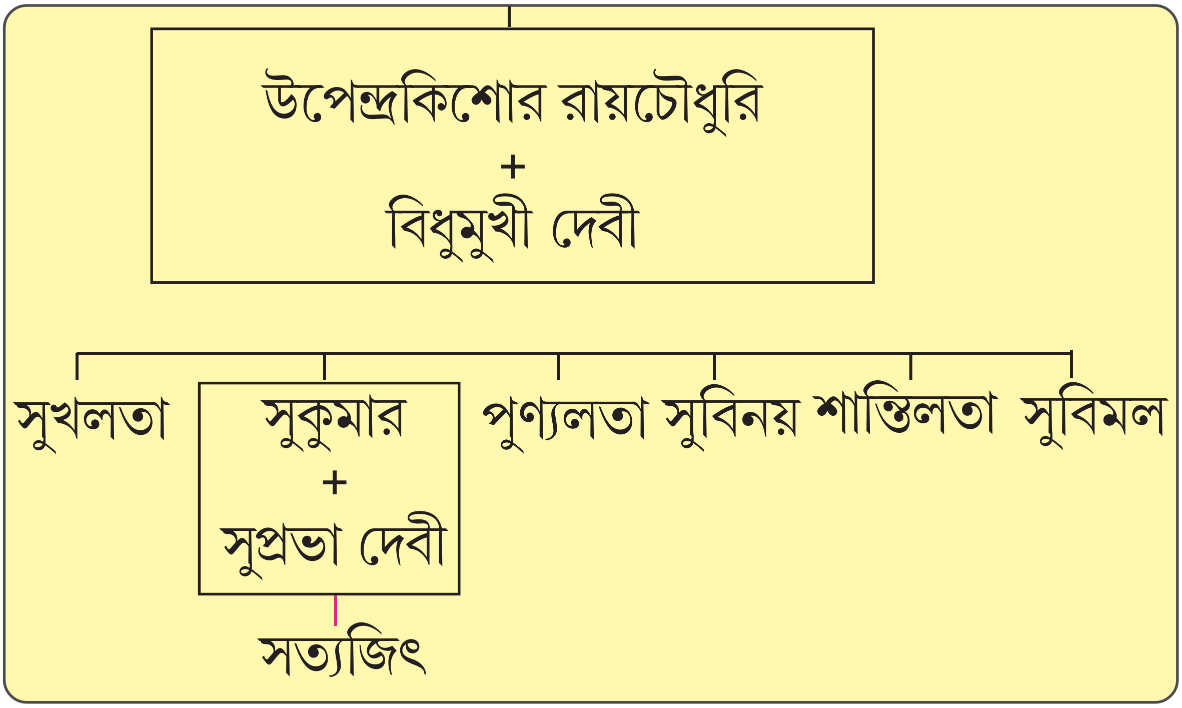

উপেন্দ্রকিশোর ও বিধুমুখী দেবীর ছয় ছেলে-মেয়ে। সবার বড়ো সুখলতা। তারপরে সুকুমার। সুকুমারের আরও চার ভাই-বোন। সুকুমার ও সুপ্রভা দেবীর একমাত্র ছেলে সত্যজিৎ রায়। এই নামটাও তো তুফান জানে! ফেলুদার গল্পগুলো আর সিনেমায় গুপি গাইন বাঘা বাইন ওর খুব প্রিয়।

স্কুলে গিয়ে তুফান বলল সব। শুনে দিদিমণি বললেন— এভাবেই নাম দিয়ে পরিবারের শাখা-প্রশাখা লিখে দেখাতে হয়। তুমি যেটা দেখেছ সেটা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির পরিবারের শাখা-প্রশাখা।

তুফান বলল— কিন্তু দিদি একটাই কেন? বাকিদেরটা কোথায়?

— বাকিদেরটা দেখানো হয়নি। তুমি ওঁদের পরিবারের শাখা-প্রশাখাটা বোর্ডে লিখে দেখাও।

তুফান লিখল। সেটা দেখে কেতকী বলল— আমরাও নাম দিয়ে নিজেদের পরিবারের শাখা-প্রশাখা করব।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

১) নাম দিয়ে নিজের পরিবারের শাখা-প্রশাখা তৈরি করো :

২) তোমাদের নিকট আত্মীয়দের সম্পর্কে নীচে লেখো:

নিকট আত্মীয় (নাম ও সম্পর্ক)	কোথায় থাকেন

সকলের তরে সকলে আমরা

স্কুলে যাওয়ার সময় কেয়া দেখে বাগানে ভাইয়ের হাতে প্লাস্টিকের ব্যাট। ঠাকুমা বল ছুঁড়ছেন। বল কুড়োচ্ছেন।

কেয়া বলল— এই ভাই! ঠাকুমাকে আবার খাটাচ্ছিস?

ভাই বলল— বাঃ! আমি তো একটু পরেই ঠাকুমার পাকা চুল তুলে দেব!

পরদিন স্কুল থেকে ফিরল কেয়া। তার গলা

শুনেই ঠাকুমা ডাকলেন--- দিদিভাই, সুচে সুতোটা পরিয়ে দাও তো।

কেয়া ঠাকুমার ঘরে গেল। ঠাকুমা সেখানে বসেই কাঁথা সেলাই করছেন। সুচে সুতো পরিয়ে দিতে দিতে কেয়া বলল— কোমরে আর পিঠে ব্যথা হলে কিন্তু আমি জানি না!

ঠাকুমা হেসে বললেন— তোমার বাবা কত চাদর-কম্বল কিনল তো? কিন্তু শীতের শুরুতে আর শেষে তোমার ঠাকুরদা ঠিক কাপড়ের কাঁথা চাইবে। কাঁথা না করলে হয়! ব্যথা হলে তুমি একটু মালিশ করে দেবে!

এমন সময় ঘরে ফোন বেজে উঠল। ঠাকুমা বললেন— যাও, ফোনটা ধরো। বোধহয় তোমার মা।

সেটা কেয়াও জানে। ফোন ধরতেই মা বললেন--- হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও। ঠাকুমাকে বলো, দেখিয়ে দেবেন।

কেয়া বাড়ির এসব কথা স্কুলে বলছিল। শুনে দিদিমণি বললেন — তোমাদের পরিবারে সবাই সবাইকে খুব ভালোবাসেন। তাই না?

কেয়া বলল— সবাই অন্য সকলকে সাহায্য করে।

— তুমি কীভাবে অন্যদের সাহায্য করো?

— কেউ খাবার জল চাইলে দিই। কিছু আনার দরকার হলে দোকানে যাই। কেউ বাইরে গেলে দরজার ছিটকিনি আটকে দিই। কেউ এলে দরজা খুলে দিই। বাগানের এক দিকের গাছে জল দিই। কারোর অসুখ হলে মাথায় জলপটিও দিয়ে দিই।

— বাঃ! বাড়ির সবার জন্য তুমি অনেক কিছু করো।

তারপর দিদিমণি বড়ো করে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলেন—

সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমাদের বাড়িতে একজন অন্যজনকে কীভাবে সাহায্য করেন? নীচে লেখো :

পরিবারের মানুষ	তিনি কীভাবে অন্যদের সাহায্য করেন	তিনি কীভাবে অন্যদের কী সাহায্য নেন

না-মানুষের পরিবার

পিকু হঠাৎ শুনতে পেল কাকগুলো খুব ডাকছে। বাইরে বেরিয়ে দেখল একটা বিড়াল। গাছের গুঁড়িতে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে কাক একটা বিড়ালকে তাড়া করছে। তাকে গাছে উঠতে দেবে না। সে উঠতেও পারছে না। পিকু ভাবল, কাকগুলো এত রাগ করছে কেন? এবার গাছের দিকে দেখল পিকু। একটা ডালে কাকের

বাসা রয়েছে। কয়েকটা ছানাও আছে। একটা কাক তাদের কাছে রয়েছে। অন্য কাকেরা বিড়ালটাকে তাড়া করছে। এতক্ষণে পিকু বুঝতে পারল। বিড়ালটা যাতে কাকের বাচ্চাদের নাগাল না পায়। তাই কাকেরা সবাই বিড়াল তাড়াতে ছুটে এসেছে। মা-কাক বাচ্চাদের আগলাচ্ছে। ও ভাবল, কাকগুলো কি সবাই মিলে একটা পরিবার?

স্কুলে গিয়ে পিকু সব বলল।

ডমরু বলল— হ্যাঁরে, মানুষের মতো পাখিদেরও পরিবার আছে। চড়াইরাও ওইরকম।

দিদিমণি এসব শুনে হাসলেন। বললেন— কাকগুলো সবাই হয়তো এক পরিবারের নয়। তবে এক পাড়ার। তোমাদের পাড়ায় কারো বিপদ হলে তোমরা সবাই তার পাশে দাঁড়াও না?

— দাঁড়াই তো!

— এও সেই রকম। তবে পাখিদেরও পরিবার থাকে। দেখবে, সারাক্ষণ দুটো কাক ওই বাচ্চাগুলোকে আগলাবে। একটু বড়ো হলে ওদের খাওয়াবে। ওড়া শেখাবে। তবে বড়ো হয়ে গেলে পশু-পাখির বাচ্চাদের সঙ্গে বাঁধন

আলগা হয়ে যায়।

বৈশাখী বলল—কুকুর,বিড়ালরাও ছোটো বাচ্চাদের খুব আগলায়।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমরা আরও অনেক না-মানুষ প্রাণী চেনো। পশু, পাখি, মৌমাছিদের মতো পতঙ্গ। এদের পরিবার বিষয়ে নিজেরাই অনেক জানো। নীচে সেইসব না-মানুষ প্রাণীর পরিবার নিয়ে লেখো:

না-মানুষ প্রাণীর নাম	তাদের পরিবার বিষয়ে কী দেখেছ	তাদের পরিবার বিষয়ে কী বুঝেছ

চিঠি পাওয়ার আনন্দ

কেতকী আর টিকাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। পথেই পিয়নদাদা কেতকীকে একটা চিঠি দিলেন। উপরে ওরই নাম লেখা। তারপর বাবার নাম, গ্রাম, পোস্টঅফিস, জেলা। চিঠির বাঁ পাশে ছোটোপিসির নাম। তার নীচে অনেক কিছু লেখা।

কেতকী বলল— এ তো ছোটোপিসির নাম। তার তলায় কী লিখেছে?

পিয়নদাদা বললেন— ছোটোপিসির ঠিকানা।

কেতকী এবার বুঝল। ছোটোপিসি শিবনাথ বোসের বাড়িতে থাকে।

পরদিন কেতকী স্কুলে পোস্ট কার্ডটা নিয়ে গেল।

সুমনার কাকা কলকাতা থেকে এরকম চিঠি পাঠান। সুমনা বলল— এটা কেতকীর চিঠি। তাই ওর নাম ডান-পাশে। যিনি পাঠাচ্ছেন তাঁর নাম বাঁ-পাশে। এভাবেই চিঠিতে ঠিকানা লিখতে হয়। শহরে আবার বাড়ির নম্বর থাকে। আর যে রাস্তার পাশে বাড়ি, সেই রাস্তার নাম থাকে।

ডমরু বলল— পোস্টঅফিসের নাম লিখতে হয় না?

— পিনকোড আসলে পোস্টঅফিসের নম্বর। কলকাতার সব পোস্টঅফিসের নম্বর ৭০০ দিয়ে শুরু। তারপর আরো

তিনটে সংখ্যা থাকে।

— কেতকীর পিসি যেখানে থাকেন সেখানকার পোস্ট অফিসের নম্বর ০২৮?

— হ্যাঁ। আমার কাকার বাড়ির ঠিকানায় পিনকোড ৭০০ ০৬৪। তার মানে, সেখানকার পোস্ট অফিসের নম্বর ০৬৪।

এমন সময় দিদিমণি ক্লাসে এলেন। সব শুনে বললেন— পোস্ট অফিস কথাটা ইংরাজি। বাংলায় বলে ডাকঘর। দেশের সব বড়ো ডাকঘরের পিনকোড নম্বর আছে। এখানকার পিনকোড ৭১২ ৪১৯। ওই একই পিনকোডে আবার কয়েকটা ছোটো ডাকঘর আছে। তাহলে তোমরা এবার থেকে চিঠিতে ঠিকানা লিখতে পারবে!

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নিজের, বন্ধুদের আর নিকট আত্মীয়দের ঠিকানা নীচে লেখো :

তোমার নিজের ঠিকানা	বন্ধুদের ঠিকানা	নিকট আত্মীয়দের

भारत
INDIA 80
पोस्ट कार्ड की शताब्दी
CENTENARY OF POST CARD
1879-1979
15 भारत INDIA 15
SIMLA H.O.
প্রতি:
কেতকী হেমব্রম
প্রযত্নে: হাম্বির হেমব্রম
গ্রাম: মীরপাড়া
পো: খালতাপুর
জেলা: হুগলি
পিন কোড: ৭১২৪১৯
पिन PIN
প্রেরক:
নন্দিনী হেমব্রম
প্রযত্নে: শিবনাথ বোস
১৮-এ, ফকির ঘোষ রোড
কলকাতা-৭০০০২৮

ডাকঘরটা চিনতে শেখা

ঠিকানা লিখতে বসে নিতাই ভাবল, আমাদের গ্রামে তো ডাকঘর নেই! তামিমদের গ্রামের ডাকঘরেই সবাই যায়। কিন্তু ডাকঘরটা কোথায়? তামিমের কাছে জানতে চাইল। তামিম বলল— হাসানচাচার বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে যাবি। তারপর সোজা দক্ষিণে।

নিতাই বুঝতে পারল না। তখন দিদিমণি বললেন—

তামিম, ডাকঘর যাওয়ার পথের মানচিত্র আঁকতে পারবে?

তামিম বলল— কিন্তু দিদি, ডাকঘরের মানচিত্র কী করে আঁকব? অনেক দূর তো!

— সব কিছু দেখাবে না। দিকটা ঠিক রাখবে। রাস্তাগুলো দেখাবে। যেখানে দুই রাস্তা আছে, সেখানে কোন দিকে যাবে সেটা যেন বোঝা যায়। আর পাশে পুকুর, ধানখেত, মাঠ, বড়ো বাড়িগুলো দেখাবে।

— ওই গুলোর চিহ্ন ঠিক করে নেব?

— হ্যাঁ, এবার চেষ্টা করো।

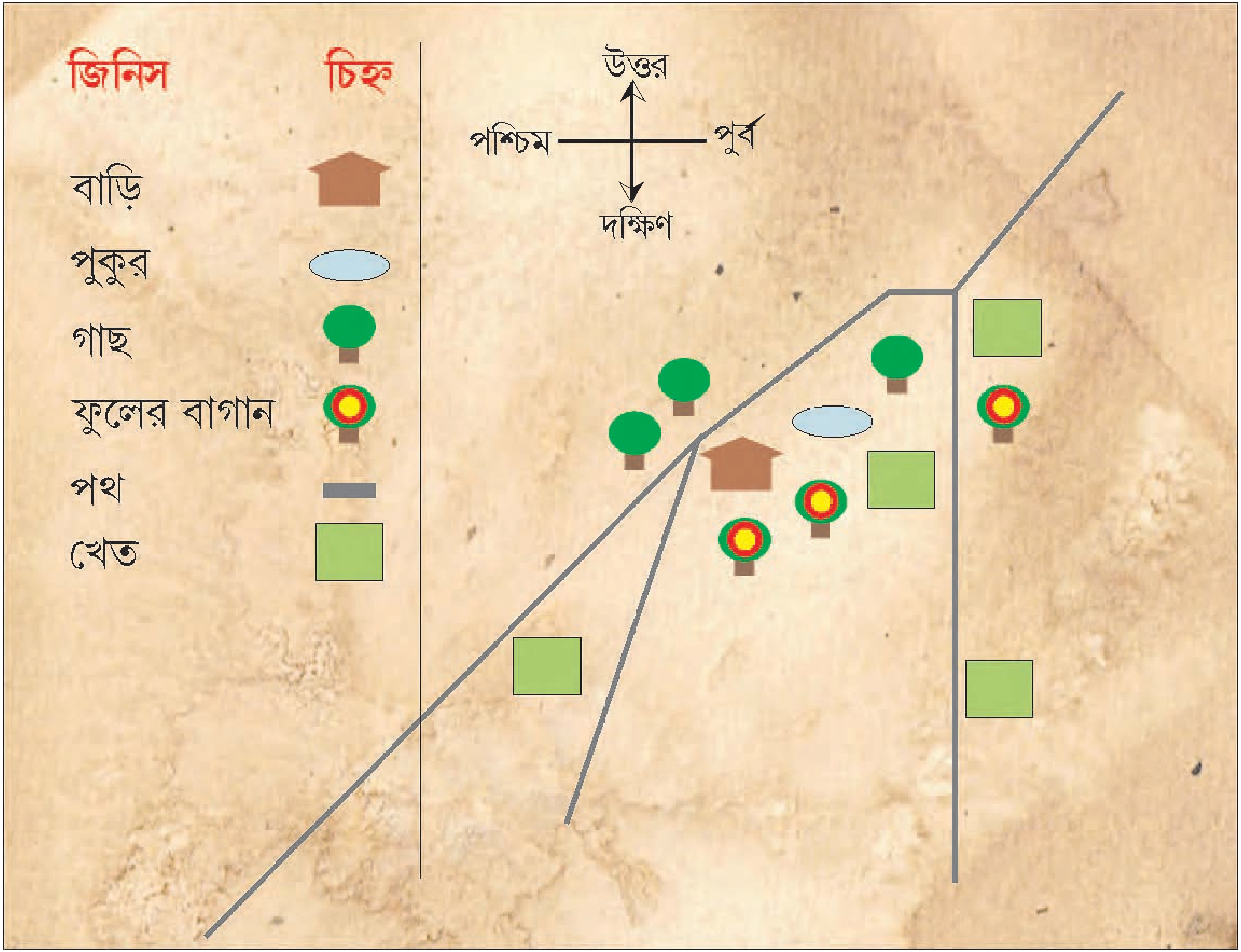
জিনিস
চিহ্ন
বাড়ি
পুকুর
গাছ
ফুলের বাগান
পথ
খেত
উত্তর
পশ্চিম
পূর্ব
দক্ষিণ

তামিম আর নিতাই চিহ্নগুলো ঠিক করে নিল। তারপর ডাকঘর যাওয়ার পথের মানচিত্র আঁকল। প্রথমে পূর্বদিকে। তিন রাস্তার মোড় থেকে উত্তর-পূর্বে। তারপর দুটো বড়ো বাড়ি। একটা পেরিয়ে সোজা দক্ষিণে পাকা রাস্তা। নিতাই বলল— আমি আজ বাড়ি ফেরার সময় ডাকঘরটা চিনে যাব।

তোমাদের ডাকঘরটা চেনো? ডাকঘরে একবার যাও। রাস্তাটা চিনে নাও :

কাকে চিঠি লিখতে চাও? পাশের ফাঁকা পোস্ট কার্ডটায় তাঁর ঠিকানা লেখো। ঠিক জায়গায় নিজের ঠিকানা লেখো :

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

১। তোমার বাড়ি থেকে স্কুলে আসার পথে যা যা আছে তার চিহ্ন ঠিক করে নাও। সেই পথের মানচিত্র আঁকো:

জিনিস	চিহ্ন	
পুকুর		

২। বাড়ি বা স্কুল থেকে ডাকঘরে যাওয়ার রাস্তার মানচিত্র আঁকো:

নতুন পথে চলা

ক্লাসে সবাই নিজের আঁকা মানচিত্র দেখাল। কে কেমন এঁকেছে তা দেখাদেখি হলো।

দিদিমণি বললেন— ঠিকানা লেখা হলো। মানচিত্র আঁকা হলো। কিন্তু আসল কথাটা তো নতুন জায়গা চিনে যাওয়া!

আমিনা বলল— দিদি, কালই আমি একা একটা নতুন জায়গায় যাব।

— লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে করে যাবে। প্রথমে জানবে গ্রামটা কোথায়। গ্রামে পৌঁছে যাদের বাড়ি যেতে চাও তাদের নাম বলবে। জানবে বাড়িটা কোথায়। এভাবে চেনা হয়ে যাবে।

বাড়িতে গিয়ে আমিনা দিদিমণির কথা বলল। মা তো শুনে অবাক। বললেন— দূরের অচেনা গ্রামে একা যাবে কেন? তোমার কি কেউ নেই নাকি?

অনেক কথার পর যাওয়া ঠিক হলো। নিজেদেরই আগের বাড়ি ঝিঙেপোতায়। সেখানেই যাওয়া হবে। মা সঙ্গে যাবেন। তবে রাস্তা চেনাবেন না। বাস থেকে নেমে যাকে যা জিজ্ঞেস করার আমিনাই করবে।

ঠিকানাটা আগেই লিখে নিয়েছিল আমিনা। বড়োচাচারা সেখানেই থাকেন। বাস থেকে নেমে তিনটে গ্রাম পেরিয়ে যেতে হয়। আমিনা সাতজনকে জিজ্ঞেস করেই পৌঁছে গেল। মেয়ের কাণ্ড দেখে মা একেবারে অবাক!

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

ঠিকানা জেনে একটা অচেনা বাড়িতে যাও। ফিরে গিয়ে পথের মানচিত্র আঁকো :

জিনিস	চিহ্ন	তোমার ঠিকানা	যেখানে গেলে, সেখানকার ঠিকানা

বাড়ি বদলে যায়

পরদিন বাসস্টপ থেকে সেই বাড়ি পর্যন্ত মানচিত্র এঁকে নিয়ে এল আমিনা। স্কুলে সবাইকে দেখাল। রবীন বলল— তোদেরই বাড়ি। অথচ তুই আগে যাসনি?

ডমরু বলল— ওখান থেকে তোরা এখানে চলে এলি কেন?

কারণটা আমিনা জানত। বলল— ওখানে খুব বন্যা হয়।

এবার মৌমিতা বলল— অনেকদিন আগে আমাদেরও বাড়ি ছিল ঝিঙেপোতায়। ঠাকুমার কাছে শুনেছি।

রবীন বলল— তোরাও কি বন্যার জন্য চলে এসেছিলি?

— তা ঠিক জানি না। আমার ঠাকুরদা এখানকার স্কুলে পড়াতেন। তাই এখানে এসে বাড়ি করেছিলেন।

দিদিমণি এসে এসব শুনলেন। তারপর বললেন— অনেক পরিবারই এই রকম ঠিকানা বদলায়। নানাকারণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। আমিই তো এই গ্রামে চাকরি করতে এসেছি।

সুমনা বলল— আমার কাকা চাকরি করতে কলকাতায় গেছেন।

— তোমাদের চেনা আরো অনেকে অন্য জায়গা থেকে এসেছেন। কেউ বা অন্য কোথাও চলে গেছেন। এসব নিয়ে তোমরা কী জানো ভাবো তো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমাদের চেনাজানা কারা ঠিকানা বদল করেছেন? সে বিষয়ে নীচে লেখো:

কার কথা বলছ	কোথা থেকে এসেছেন বা কোথায় চলে গেছেন	কেন এসেছেন বা কেন চলে গেছেন

জীবিকার আদিকথা

কেতকীরা আগে পাশের রাজ্যে থাকত। অনেকদিন আগে ওর ঠাকুরদার বাবা কাজের জন্যই এখানে এসেছিলেন। অন্যের জমিতে চাষের কাজ। এখানে বেশি কাজ পাওয়া যেত। আয় বেশি হতো। কেতকীর ঠাকুরদারও জীবিকা ছিল অন্যের জমিতে চাষ করা। কিন্তু কেতকীর বাবা পঞ্চায়েতে চাকরি করেন। এভাবে ওদের জীবিকা বদলে গেছে।

স্কুলে একথা বলায় শান্তনু বলল— আমাদেরও তাই। ঠাকুরদা স্কুলে পড়াতেন। কিন্তু বাবা বাড়ি তৈরির জিনিসের দোকান করেছেন। কাকাও সেই দোকান দেখেন। এখন আমাদের জীবিকা হলো ব্যবসা।

আলি বলল— আমার দাদা গামছা বুনতেন। আব্বা টেলারিং-এর দোকান করলেন। বদলে গেল জীবিকা।

চিনু বলল— আমার ঠাকুরদা চুল কাটতেন। বাবা এখন

বাসের ড্রাইভার। বড়োজেঠু অবশ্য সেলুন খুলেছেন। এখনও চুল কাটেন।

আকাশ বলল— আমার ঠাকুরদা মাছ ধরতেন। বাজারে বেচতেন। বাবাও মাছ ধরে, বাজারে বেচেন।

দিদিমণি ক্লাসে এসে ওদের আলোচনা শুনলেন। তারপর আকাশকে বললেন— তোমাদের পারিবারিক জীবিকা এখনও বদলায়নি। তুমি বড়ো হলে হয়তো বদলাবে!

একথা শুনে কেতকী বলল— দিদি, পারিবারিক জীবিকা মানে কী?

— বহু কাল ধরে কিছু পরিবারের লোকরা একই ধরনের কাজ করেছেন। যেমন কর্মকার, কুম্ভকার, কৃষক —আরও অনেক কিছু। এইগুলো পারিবারিক জীবিকা।

অ্যালিস বলল— এখন আর সেভাবে পারিবারিক জীবিকা নেই! একই পরিবারের লোকরা আলাদা আলাদা কাজ করেন।

— ঠিক তাই।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নিজের আর বন্ধুদের পারিবারিক জীবিকা, এখনকার জীবিকা এসব নিয়ে যা জানো নীচে লেখো :

নাম	পারিবারিক জীবিকা	এখনকার জীবিকা

জীবিকার বাকি ইতিহাস

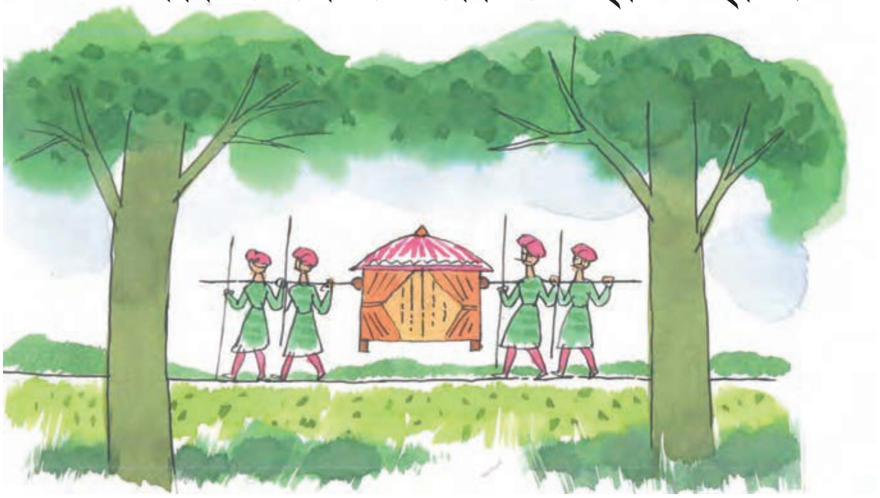

হেনা ভাবল, আগে তো বাস ছিল না। তাহলে আর লোক ড্রাইভার হবে কী করে? সেকথা বাড়িতে বলতেই ঠাকুমা বললেন--- আগে তেমনি লোকে পালকি চেপে যেত। পালকির বেহারা হওয়া একটা জীবিকা ছিল। ঠাকুরদা বললেন— ঘোড়ার গাড়ি ছিল। সেই গাড়ি চালাত কোচোয়ান। সেটাও ছিল একটা জীবিকা ।

একটু পরে হেনার দাদা বেরিয়ে গেলেন। উনি ক্যাটারারের কাজ করেন। বিয়ে বাড়িতে পরিবেশন করবেন। ওর বাবা গেলেন দোকান খুলতে। উনি দোকানে ফোটোকপি করেন। পরদিন দিদিমণিকে হেনা এসব কথা বলল। উনি বললেন— হ্যাঁ। কিছু জীবিকা এখন আর নেই। সেগুলো লুপ্ত জীবিকা। কিছু জীবিকা আগে ছিল না, এখন হয়েছে। সেগুলো নতুন জীবিকা।

নিতাই বলল— দিদি, কম্পিউটারের দোকান করা একটা নতুন জীবিকা।

বৈশাখী বলল— আগে অনেকে শাঁখা ফেরি করতেন। ফেরিওলারা ঘুরতেন আর বলতেন শাঁখা চাই। বড়োঠাকুমার কাছে শুনেছি।

— হ্যাঁ। শাঁখা ফেরি করা এই অঞ্চলে লুপ্ত জীবিকা। তবে অন্য কোথাও ওইরকম ফেরিওলা থাকতেও পারেন।

ডমরু বলল— অনেক আগে তো লোকে বল্লম দিয়ে শিকার করত?

— হ্যাঁ। শিকার খুব প্রাচীন এক জীবিকা। এখন অবশ্য বন্যপ্রাণী সংখ্যায় খুব কমে গেছে। তাই শিকার করা নিষিদ্ধ। কুমোরের কাজ, কামারের কাজ এসবও প্রাচীন জীবিকা।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

প্রাচীন জীবিকা, লুপ্ত জীবিকা, নতুন জীবিকা নিয়ে আরও আলোচনা করো। তারপর নীচে লেখো:

প্রাচীন জীবিকার নাম ও কাজ	লুপ্ত জীবিকার নাম ও কাজ	নতুন জীবিকার নাম ও কাজ

নীল আকাশের রহস্য

গাছের ডালে মৌচাক দেখছিল মন্দিরা আর ইমরান। মৌমাছিদের যাওয়া আসার শেষ নেই। উড়তে উড়তে একজন আকাশে হারিয়ে গেল। একজন আবার এসে ঢুকল মৌচাকে। মন্দিরা বলল— ওদের মতো তোর নীল আকাশে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না?

ইমরানও তাই ভাবছিল। বলল— করে তো!

— ইচ্ছে হয়, উড়তে উড়তে সাদা মেঘের পিছনে চলে যাই!

— আচ্ছা, সাদা মেঘের পিছনে আকাশের কী রং বল তো?

— নীলই হবে। এমনিতে আকাশ তো নীলই। কাকা বলেছিলেন, মেঘে জলের কণা থাকে। খুব অল্প ছোটো ছোটো জলকণা থাকলে মেঘ সাদা।

পরদিন স্কুলে এসে দিদিমণিকে ইমরান এসব কথা বলল। সবাই শুনল। দিদিমণি বললেন— অনেক ছোটো ছোটো জলকণা থাকলে মেঘ কালো। আর জলকণা বড়ো বড়ো হয়ে গেলে মেঘ ছাই ছাই দেখায়।

আলি বলল— কিন্তু এমনিতে কি আকাশ নীল? রাতে কি নীল দেখায়?

সুমি বলল— ঠিক! রাতে তো কালো আকাশে তারা ঝিকমিক করে।

— কিন্তু চাঁদের কাছাকাছি জায়গাটায় মাঝে মাঝে আলো দেখা যায়।

হারান বলল— দিদি, দিনের বেলাও সূর্যের কাছের আকাশটা

ঠিক নীল নয়। সূর্য থেকে দূরের আকাশটা নীল হয়।

দিদি বললেন --- ঠিক বলেছ। কিন্তু তুমি সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলে নাকি? সোজাসুজি সূর্যের দিকে তাকালে চোখের ক্ষতি হবে।

সবুজ বলল— কী করে বুঝব কোন দিকে সূর্য?

রাবেয়া বলল— নিজের ছায়াটা দেখতে হবে। ছায়ার ঠিক উলটো দিকে সূর্য থাকে।

— ঠিক বলেছ। এবার বলো দেখি বিকেলে সূর্য কোন দিকে থাকে?

— পশ্চিম দিকে। তখন আমার ছায়া থাকবে পূর্ব দিকে।

— ঠিক। তখন ছায়ার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে সামনে পূর্বদিক, পিছনে পশ্চিম, ডানদিকটা দক্ষিণ, বাঁদিকটা

উত্তর। বাড়িতে গিয়ে ভালো করে দেখে বুঝে নেবে। ছুটির দিনে কয়েক ঘণ্টা অন্তর নিজের ছায়াটা দেখবে। তার সঙ্গে খেয়াল করবে কখন কোন দিকে সূর্য ছিল।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন জায়গায় আকাশের কী রং দেখেছ, তা নীচে লেখো :

কোন ঋতুতে দেখেছ	কোন সময় দেখেছ	আকাশের কোন জায়গা	কেমন রং
গ্রীষ্ম	সকাল	পশ্চিম দিক	

সূর্য থেকে আলো, সূর্য থেকে তাপ

এ কেমন কথা? নানা সময়ে আকাশের রং নানারকম! সন্দীপ বলল— দিদি, আকাশের রং কি বদলে যায়? দিদিমণি বললেন— আসলে আকাশের কোনো রং নেই। বাতাস রয়েছে। বাতাসে ছোটো ছোটো ধুলোর কণা ভাসে। দিনের বেলা এসবের উপর সূর্যের আলো পড়ে। তাই রং দেখা যায়। রাতের আকাশে সূর্য থাকে না।

তাই আকাশ কালো।

রবীন বলল— চাঁদ থাকলে একটু আলো হয়। তাই কিছুটা দেখা যায়। তাই না?

কেতকী বলল— চাঁদের আলো কম। বেশি দূর দেখা যায় না। দিনের বেলা অনেক দূরের জিনিস দেখা যায়।

— বেশ। অমাবস্যার রাতে আকাশে চাঁদ থাকে না। তখন কত দূর দেখা যায়?

— সামনে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও চেনা যায় না।

— আর আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ থাকলে?

কেতকী বলল— আট-দশ মিটার দূরের চেনা লোককে চেনা যায়।

হারান বলল— আট-দশ মিটার মানে?

— তিনতলা বাড়ির নীচ থেকে ছাদটা আট-দশ মিটার হয়। পূর্ণিমার রাতে নীচ থেকে ছাদের লোক চেনা যায়।

রফি বলল— ওঃ! একটা বড়ো নারকেল গাছ যেমন উঁচু হয়।

দিদিমণি বললেন — আচ্ছা, দিনের সবসময় কী একই

রকম আলো হয়?

— না, বিকেলে আলো কমে যায়। গরমও কমে যায়।

— সূর্যের আলো কমলেই কি গরমও কমে?

— অনেক সময় মেঘ করলে আলো কমে, কিন্তু গরম কমে না।

— বেশ বলেছ তো!

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

আলো আর গরম কোন সময়ে বাড়ে আর কমে তা ভালো করে দেখে ও অনুভব করে নীচে লেখো :

সময়	ঘটনা	দিনের আলো বাড়া-কমা	গরম বাড়া-কমা
সকাল	পূর্ব আকাশে সূর্য		

দিনভর ছায়ার খেলা

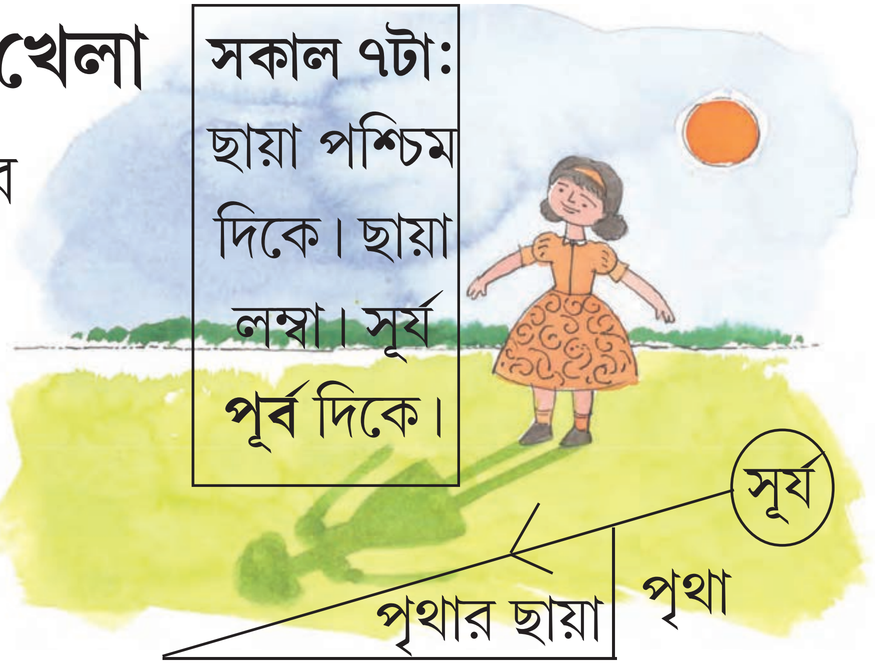

কখন কোথায় নিজের ছায়া পড়ছে তা মন দিয়ে দেখল পৃথা। ছায়াটা ওর চেয়ে লম্বা না খাটো তাও দেখে লিখল। আর ছায়ার উলটো দিকে সূর্য। এটা বুঝে সূর্য কোথায় ছিল তাও লিখল। ছবিও আঁকল।

স্কুলে সবাইকে সেটা দেখাল। দিদিমণি বললেন— এই ছবির বদলে একটা সহজ ছবি এঁকে ছায়াটা বোঝানো যায়।

এই বলে দিদি একটা ছবি এঁকে দেখালেন। বললেন — এটা পৃথার ছায়ার রেখাচিত্র।

একটা রেখা পৃথা, একটা রেখা সূর্য থেকে পৃথার মাথা ছুঁয়ে গেছে। আর একটা রেখা পৃথার ছায়া।

সবাই খুব ভালো করে দেখল। হামিদ বলল— আমিও আঁকতে পারব।

দিদি পৃথাকে বললেন— সা পরে আর ছায়া দেখোনি?

পৃথা বলল— তারপর দশটায় দেখেছি। স্কুলে আসার আগে। তখন সূর্য পূর্বে, কিন্তু প্রায় মাথার উপরে।

এই বলে দশটার সময় নিজের ছায়া, সূর্য আর নিজের ছবিটা দেখাল পৃথা।

ছবি দেখেই হামিদ দশটার সময় পৃথার ছায়ার রেখাচিত্রটা আঁকল।

দিদি বললেন— এই তো শিখে গেছ। ছুটির দিনে সবাই দেখবে। সারদিনে ছ-বার। দেখবে, রেখাচিত্র আঁকবে।

সকাল ১০টা :
ছায়া পশ্চিম দিকে।
ছায়া খাটো।
সূর্য **পূর্ব** দিকে,
প্রায় মাথার উপরে।

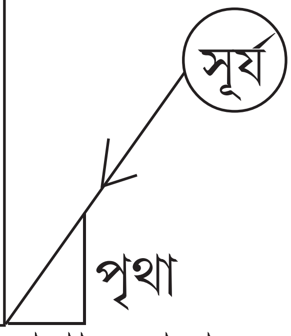

সারাদিনে ছয়বার নিজের ছায়া দেখো। তোমার নিজের, সূর্যের আর তোমার ছায়ার রেখাচিত্র আঁকো। কোন সময়ের ছবি তাও পাশে লেখো। নিজেদের খাতায়ও এঁকে এবং লিখে রাখতে পারো :

চাঁদমামার লুকোচুরি

ভালো করে সূর্য দেখার পর পৃথা ভাবল, চাঁদ কোথায় ওঠে? কোথায় ডোবে? সন্ধ্যাবেলা আকাশে চাঁদ খুঁজল। কোথাও নেই। মাকে বলল— মা আকাশে তো মেঘ নেই। তবু চাঁদ দেখা যাচ্ছে না কেন?

মা বললেন--- কাল অমাবস্যা গেল! আজ থেকে শুক্লপক্ষ শুরু। আজ প্রথম সন্ধ্যা। আমরা বলি শুক্লপক্ষের

প্রথমা তিথি। আজ চাঁদ দেখা যাবে না। কাল সন্ধ্যাবেলা দেখতে পাবে।

পরের সন্ধ্যায় পৃথা আবার দেখল। সত্যিই তো, বাঁকা কাস্তের মতো সরু একটা ফালি চাঁদ উঠেছে। পশ্চিম আকাশে! মাকে বলল— মা, চাঁদ পশ্চিম আকাশে ওঠে? সূর্যের মতো পূর্ব আকাশে ওঠে না?

মা হাসল। বললেন— রোজ সন্ধেবেলা দেখো। তারপর বুঝবে। আজ শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া। এরপর তৃতীয়া, চতুর্থী। এভাবে চলবে।

আধ ঘণ্টা পরে আবার চাঁদ দেখতে গিয়ে পৃথা অবাক। চাঁদটা কোথাও নেই।

পরের তিনদিন পৃথা ভালো করে লক্ষ করল। পরপর চাঁদটা বড়ো হচ্ছে। আর মাঝ আকাশের দিকে সরে সরে উঠছে।

তিনদিন পর। ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। পৃথা খুব ভালো করে দেখল চাঁদটা। কমলালেবুর কোয়ার মতো দেখাচ্ছে। মাকে

দেখাল। মা বললেন — পূর্ণিমার দিকে যত যাবে, চাঁদটা তত বড়ো হবে।

পরদিন স্কুলে এসব কথা বলল পৃথা।

স্বপন বলল— আমিও দেখেছি দিদি। পূর্ণিমার সন্ধ্যায় চাঁদটা ঠিক পূর্ব আকাশে ওঠে। গোল থালার মতো!

আয়ুব বলল— পূর্ণিমার আকাশে শুধুই চাঁদ। তারা বেশি দেখা যায় না।

দিদিমণি বললেন— ঠিক বলেছ। পূর্ণিমার পর থেকে কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়। প্রথম সন্ধ্যাকে বলে কৃষ্ণপক্ষের প্রথমা। তারপরের সন্ধ্যায় কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া, তারপর তৃতীয়া। এভাবে চলতে থাকে। কোন তিথিতে আকাশে অনেক তারা দেখা যায় বলতে পারো?

সবাই ভাবতে থাকল। পৃথা বলল— এবার ভালো করে দেখব।

— বেশ। আগামী এক মাস ধরে রোজ দেখবে। কবে, কোনদিকে চাঁদ উঠছে। কত বড়ো। কোনদিকে সরছে। কোথায় অস্ত যাচ্ছে। আকাশে তারা কম নাকি বেশি!

চাঁদ আর তারা দেখো। যা দেখছ সেসব কয়েকদিন অন্তর লেখো। রোজ লিখতে চাইলে খাতায় লেখো :

অমাবস্যার কতদিন পরের কথা	চাঁদের ছবি	আকাশের কোনদিকে ও কখন চাঁদ উঠেছে	চাঁদ কোনদিকে সরছে ও কোথায় অস্ত যাচ্ছে	আকাশে আগের রাতের চেয়ে তারা কম নাকি বেশি
তিনদিন		পশ্চিম দিকে, সন্ধ্যাবেলা	পশ্চিম দিকে, পশ্চিম দিকে	
পূর্ণিমার কতদিন পরের কথা				

তারায় তারায় আলোর নদী

রাতের আকাশে কত তারা! ফুটকি ফুটকি আলো, বড়ো-ছোটো! মাঝ আকাশে আলোর একটা নদী! প্রায় উত্তর-দক্ষিণে। ওতেও কি অনেক তারা? তারাগুলো কি এক জায়গায় থাকে? নাকি, সূর্যের মতো সরে সরে যায়!
স্টিফেন পূর্ব আকাশে তিনটে তারা দেখে রাখল। ভাবল, পরে আবার দেখব, তারাগুলো সরে যায় কিনা। দু-ঘণ্টা পরে এসে দেখল পশ্চিমে সরে গেছে।
স্কুলে গিয়ে এসব কথা বলল। আলি বলল— আমিও দেখেছি। তারাগুলো সরে যায়।
বিশাখা বলল— তাই? আমি তো দেখেছি সারা রাতই আকাশ একই রকম তারা ভরতি থাকে।

দিদিমণি বললেন— তাহলে ভালো করে কয়েকটা তারা দেখবে। সরছে কিনা। তারপর এনিয়ে আবার কথা হবে।

স্টিফেন বলল— দিদি, তারাগুলোর কোনোটা ছোটো, কোনোটা বড়ো কেন?

আলি বলল— ছোটো আলো ছোটো দেখাবে। বড়ো আলো বড়ো দেখাবে। এ তো জানা কথা!

জেমস বলল— তা কেন? দূরে থাকলে বড়ো আলোও ছোটো দেখায়।

দিদি বললেন— তাই? কোথায় এমন দেখেছ?

— রাস্তার আলো। ঘরের আলোর চেয়ে বড়ো। কিন্তু দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটা টুনি বাল্‌ব!

অপূর্ব বলল— দেখতে ছোটো তারাগুলো সত্যিই ছোটো হতে পারে। আবার দূরের বড়ো তারাও হতে পারে।

—রাতের আকাশের দিকে কখনও তাকিয়ে দেখেছ কি? কখনও কখনও আকাশের একদিক থেকে অন্যদিক অবধি একটা আবছা আলোর আভা ছড়িয়ে আছে দেখতে পাবে। এই আবছা আলোর আভাটাই হলো ছায়াপথ। ছায়াপথে ছোটো-বড়ো অনেক তারা থাকে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তারা আর ছায়াপথ বিষয়ে আর কী কী দেখেছ? নীচে লেখো :

কোন তিথিতে ছায়াপথ দেখেছ	
সন্ধ্যা থেকে রাতে কোনদিকে তারা সরতে দেখেছ	
ছায়াপথের একটা ছবি আঁকো	

তারার কথা, মেঘের কথা

সবাই ভালো করে দেখে একমত হলো। তারাগুলো পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যায়। নন্দিনী প্রথমে উত্তর আকাশের তিনটে তারা দেখেছিল। সেগুলো সরেছে কিনা বুঝতে পারেনি। পরে উত্তর-পূর্ব কোণের তিনটে তারা দেখে রেখেছিল। আরও দু-ঘণ্টা পরে দেখেছে, সেগুলোও পশ্চিম দিকে সরেছে।

দিদিমণি বললেন--- কেউ দক্ষিণ আকাশের তারা দেখোনি?

রেহানা বলল— দেখেছি। সেই তারাগুলোও সরে গেছে।

--- বেশ। আজ সন্ধ্যাবেলা পূর্ব, উত্তর আর দক্ষিণ আকাশের তারা দেখবে। কোনটা বেশি সরছে, কোনটা কম সরছে।

— আজ আকাশে মেঘ রয়েছে। রাতে কী আর দেখা যাবে?

— বেশ তো। যে সন্ধ্যায় মেঘ থাকবে না, সেই সন্ধ্যায় দেখবে।

অবন্তি বলল— দিদি, মেঘ কেন হয়?

সুজন বলল--- পুকুরের জল বাষ্প হয়ে যায়। সেই বাষ্পই মেঘ।

— অনেকটা ঠিক বলেছ। তবে জলের বাষ্প দেখা যায় না।

সুজন অবাক। বলল— জল ফোটালে ধোঁয়ার মতো বাষ্প ওড়ে তো?

—সেগুলোও জলকণা।

অবন্তি বলল— শীতকালে পুকুরের উপরে যে ধোঁয়া দেখা যায়?

— ওগুলোও জলকণা। জলের বাষ্প সামনের বাতাসেও রয়েছে। কিন্তু দেখা যায় না। ফুটন্ত জল থেকে একটু উঠেই বাষ্প ঠান্ডা হয়ে যায়। বাতাসে ভেসে থাকা খুব ছোটো ধুলোর কণার গায়ে ছোটো ছোটো জলকণা জমে। সেইগুলো ধোঁয়ার মতো দেখা যায়।

রেহানা বলল— আর মেঘ?

— নদী, সাগরের জল শুকিয়ে বাতাসের জলীয় বাষ্প বাড়ে। বাতাসে ভেসে থাকা ধুলোর কণার গায়ে ওই বাষ্প ঠান্ডা হয়ে জলকণা হিসাবে জমে। পাশাপাশি ভাসে। তারা সূর্যের আলো আটকে দেয় বা নানাদিকে ছড়িয়ে দেয়। আকাশের সেই জায়গাটাকেই বলে মেঘ।